রাজত্ব করলেও শাসন করেন না। বস্তুত রাজা বা রানি ক্ষমতাহীন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এককথায় কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই রাজা বা রানির ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন মূল্য নেই।

কিন্তু সঠিক অবস্থা যথার্থ পর্যালোচনা করলে রাজা বা রানির পদমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি অভিমতের কোনও একটিকে এককভাবে সমর্থন করা যায় না। দু'ধরনের বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা সত্যতা নিহিত আছে। কারণ বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী তথ্য মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে এখনকার দিনে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা যায় না। যেমন, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু কমন্সসভায় নির্বাচনে কোনও দল যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সেক্ষেত্রে রাজা বা রানি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মত চলার ক্ষেত্রে রাজা বা রানির বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে রাজা বা রানির দক্ষতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর।

স্যার আইভর জেনিংস রাজার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, (১) রাজা বা রানির প্রভাব সংবিধানের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। (২) তাঁর প্রভাব কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। (৩) তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈকিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং (৪) রাজনৈতিক এলাকার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

(১) **সাংবিধানিক সুবিধা ঃ** রাজা বা রানি বর্তমানে সাংবিধানিক ভূমিকাই পালন করেন। তাই রাজশক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আইভর জেনিংস-এর মতে রাজা বা রানিই শাসনতন্ত্রকে ধরে রেখেছেন।

(২) **রাজপদের ব্যবহারিক মূল্যঃ** ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় নীতি ও দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজা বা রানির পরামর্শের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(৩) **রাজা বা রানি নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল ঃ** যুদ্ধ, জাতীয় সংকট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা মানুষ

রাজা বা রানিকেই নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করেন। জনগণের এই মানসিকতাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।

(৪) **দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থান ঃ** রাজা বা রানি কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নেতা নন, তিনি আপামর জনসাধারণের রাজা। জনগণের এই অনুভূতিই ইংল্যান্ডের রাজা বা রানিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছে।

(৫) **সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করে রাজশক্তি এবং সেই জাতিকে বৈপ্লবিক অস্থিরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

(৬) **সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজা বা রানি এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির বিকল্প কোনও পদ এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

(৭) **রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঃ** ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে। এই গণতন্ত্রীকরণের জন্যই ব্রিটেনে রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

(৮) **রাজশক্তি ব্যয়বহুল নয় ঃ** অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন অথবা ফরাসি রাষ্ট্রপতির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রত্যেক বছর যে ব্যয় নির্বাহ হয়, ব্রিটেনে রাজা বা রানির তুলনায় সেই ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু রাজশক্তির সপক্ষে প্রদত্ত এই আর্থিক যুক্তি অনেকসময় গ্রাহ্য হয় না, যে কারণে বর্তমানে চেষ্টা চলছে রাজকীয় ব্যয়ের বহর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার।

(৯) **ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা ঃ** ব্রিটেনের জনসাধারণের চিন্তাধারা ও রক্ষণশীলতাও রাজশক্তি বজায় রাখার জন্য দায়ী। ঐতিহ্যের প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এখনও মানুষের আকর্ষণ রয়েছে।

(১০) **অপরিহার্যতা ঃ** ওয়াল্টার বেজহটের মতে রাজা বা রানির অস্তিত্ব ছাড়া ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থই হত না, বিলুপ্তও হ'ত।

(১১) **ধারাবাহিকতা রক্ষা ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনে রাজশক্তি নিরাচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা দেয়। কার্যরত অবস্থায় কোনও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বা কোনও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোনও মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজা বা রানির হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।

(১২) **কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঃ** রাজা বা রানি ছাড়া কমনওয়েলথের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(১৩) **অভিজ্ঞতার যুক্তি ঃ** আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলেই রাজা বা রানির পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সুযোগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেই।

উপসংহার ঃ বর্তমানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজা বা রানির ভূমিকার সমালোচনা করে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন।

(১) রাজা বা রানি কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হ'তে পারেন না।

(২) রাজপদ যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সেটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

(৩) রাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৪) রাজা বা রানি সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

(৫) মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা বা রানি সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগেও সেই রাজা বা রানি পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সেই জন্যই ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণি রাজা বা রানিকে তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী বলে তো মনে করেই না বরং রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থেই তাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই বলা যায় যে ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সহায়ক বলেই রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

০২.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রী হ'লেন সেই ক্যাবিনেটে তোরণের কেন্দ্রপ্রস্তর। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারি কাজকর্ম আবর্তিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সূচনা শতাব্দীর শেষে ও ঊনিবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীই হ'লেন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তিতে সর্বপ্রথম 'প্রধানমন্ত্রী' এই নামটি উল্লিখিত হয়। আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও কোনও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ আইন-এ প্রধানমন্ত্রী পদের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত ছিল না। ১৯৩৭ সালে 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে প্রথম আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর মর্যাদাও বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। যখন কোনও একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই দেখা দেয় না। কিন্তু কোনও দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন প্রচলিত

রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হ'লে স্ববিবেচনা প্রয়োগের কোনও সুযোগ ও সম্ভবনা থাকে না।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুখ্যত সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস। বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারাও তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনগত দিক থেকে না হ'লেও কার্যগত দিক থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনিই হলেন সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মূল্য উৎস। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত বিষয়ের চুড়ান্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** নির্বাচনের পর কমন্সসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং এই দলীয় সংখ্যগরিষ্ঠতার ওপরই তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব নির্ভরশীল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যাতে তাঁর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে সেদিকে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নতুবা কমন্সসভার আস্থা হারালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কমন্সসভার ভিতরে ও বাইরে দলীয় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হয়।

(২) **মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্র প্রস্তর। তিনি হ'লেন মন্ত্রীপরিষদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করার পর রাজা বা রানি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। মন্ত্রীসভার গঠন থেকে শুরু করে পুনর্গঠন বা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুই নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের ঐক্য ও সংহতি মূলত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীপরিষদের নেতা হিসেবে তিনি কতটা যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটকে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করেন তার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৩) **কমন্সসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন কমন্সসভার নেতা। কমন্সসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন বটে, কিন্তু কমন্সসভার কাজকর্ম তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত কমন্সসভার অভ্যন্তরে উপস্থাপিত করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাখ্যা

পেশ করেন। কমন্সসভার অভ্যন্তরে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে কোনও মন্ত্রী অসুবিধায় পড়লে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উত্তর দিতে সাহায্য করেন এবং তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেন। কমন্সসভায় বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং কমন্সসভার নেতা হিসেবে তিনি কতটা দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন মূলত তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৪) **প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রানি কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ক্যাবিনেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। বস্তুত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রানিকে পরামর্শ দেন।

(৫) **প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্যরূপকার। পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য প্রবক্তারূপে তিনি পরিচিত। আন্তর্জাতিক ঘটনবলী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকেই সরকারি বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কূটনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বলাভ করে। যুদ্ধ ও শান্তি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৬) **প্রধানমন্ত্রী রানি ও ক্যাবিনেটের যোগসূত্র ঃ** প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ও রানির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনি রানির কাছে পেশ করেন। সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রানির মতামত ক্যাবিনেটে পেশ করেন। রানি কোনও বিষয় ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য পাঠাতে ইচ্ছুক হলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই তিনি তা ক্যাবিনেটকে জ্ঞাত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই দায়িত্বভার পূর্বের মত এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রানি মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ও নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না।

(৭) **আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ঃ** প্রধানমন্ত্রীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হওয়া। কমনওয়েলথ সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব মূলত প্রধানমন্ত্রীই গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ও কার্যকর হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেই লর্ড মোর্লি (Lord Morley) তাঁকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রস্তরখন্ড' (Keystone of the Cabinet arch) নামে অভিহিত

করেছেন। আবার তাঁকে 'সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' (First among equals) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাঁর এই ভূমিকা অবশ্যই কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এইসব উপাদানগুলি হলঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা, দল ও সহকর্মীদের ওপর প্রভাব, তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি। আইনের দিক থেকে সকল প্রধানমন্ত্রী একই ক্ষমতা ভোগ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কোনও কোনও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পেরেছেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে সরকারি দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই নন, তিনি রাজা, রানি এবং ক্যাবিনেটের যোগসূত্র। তিনি মন্ত্রীপরিষদের নেতা নন, তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভার উত্থানপতন ঘটে।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বহুমুখী ও ব্যাপক ক্ষমতা তাঁকে একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যেহেতু তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন, যেহেতু তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নিজের দলকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারেন, সেহেতু তাঁকে একনায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। আসলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন যে তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রক বলা যায়।

তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সব কিছুর উর্ধ্বে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত একজন সব অর্থে স্বেচ্ছাধীন শাসক নন। কারণ প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একনায়ক হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রধানমন্ত্রীর পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবন, জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত আর্কষণ তাঁর প্রভাব প্রসারিত করে। জনপ্রিয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহজেই সরকারি সিদ্ধান্ত জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। তাঁর প্রভাব ও গুরুত্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকী আন্তর্জাতিক পরিবেশের ওপরেও নির্ভরশীল।

আসলে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকুশলতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। তিনি যদি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি ব্যপক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। আবার তিনি যদি কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত অনুকুল পরিস্থিতিতেও তাঁর পক্ষে ক্ষমতা উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ-এর বক্তব্যকে সামনে রেখে একথা বলা যায় সে পদাধিকারী যেভাবে ব্যবহার করতে চান প্রধানমন্ত্রীর পদ ঠিক সেইভাবেই তাঁর সামনে দেখা দেবে।

অনুশীলনী—৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার _____ _____ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।

২। লর্ড মোর্লি প্রধানমন্ত্রীকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত _____, বলে বর্ণনা করেছেন।

৩। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীপরিষদ ও রানির মধ্যে প্রধান _____।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

স্যার আইভর জেনিংস ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দুরূপে অভিহিত করেছেন। নির্দেশদানের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ক্যাবিনেট। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। মধ্যযুগের মহাপরিষদ (Magnum Councilium) ছিল আধুনিক ক্যাবিনেটের প্রাথমিক রূপ। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। কর ধার্যসহ অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান করাই ছিল এই পরিষদের সদস্যদের প্রধান কর্তব্য। রাজকার্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্য রাজা কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis) বা ক্ষুদ্র পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নিয়মিতভাবে এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। রাজার প্রধান কর্মচারীদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হ'ত। কালক্রমে ক্ষুদ্র পরিষদ প্রিভি কাউন্সিলে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিল সুষ্ঠু আকার ধারণ করে। প্রিভি কাউন্সিল শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মূল উৎস ছিল। এই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়াতে এই সংস্থা নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত না। সেই জন্যই রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস্ ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় চার্লস্ যে পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের আদ্যাক্ষর যুক্ত করে ক্যাবাল (Cabal) শব্দের উদ্ভব ঘটে। এই পাঁচজন সদস্য হলেন—ক্লি-ফোর্ড (Cliford), আরলিংটন (Arlington), বাকিংহাম (Buckingham), অ্যাসলী (Ashely), লডারডেল (Lauderdale) । ক্যাবাল-এর কার্য পরিচালনা পদ্ধতি কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই ক্যাবাল রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ক্যাবাল থেকেই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি।

আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের শাসনকালে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকার নীতি বর্জন করেন। রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জও ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ

করেছিলেন। ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রী রাজার কাছে পেশ করতেন। এই মন্ত্রীই পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হন। এভাবে একদিকে যেমন রাজার প্রভাব হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমন ক্যবিনেটে একজন প্রাধান্য সৃষ্টিকারী মন্ত্রীরও উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতকে প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনে ক্যাবিনেটই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শতকের শেষভাগে কমন্সসভা ক্যাবিনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় রাজা তৃতীয় জর্জ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ফলে প্রধানমন্ত্রী পিট সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন ক্যাবিনেট গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। আবার ক্যাবিনেট এর সফল সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রীগণ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন।

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভার সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাই ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা গঠন করে। ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত ঃ গঠনগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়। ব্রিটেনের সব মন্ত্রীকে নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সদস্যই মন্ত্রীসভার সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

তৃতীয়ত ঃ ক্যাবিনেটই রাজা বা রানিকে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু মন্ত্রীসভা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

চতুর্থত ঃ সাধারণত সপ্তাহে একদিন ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সপ্তাহে দু'বারও ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। কিন্তু মন্ত্রীসভার বৈঠকের ব্যাপারে এই ধরনের কোনও নিয়ম নেই। মন্ত্রীসভার বৈঠক অনিয়মিতভাবেই আহুত হয়।

পঞ্চমত ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যৌথভাবে একটি টিম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সাধারণত নিজের নিজের বিভাগীয় দায়িত্বে কাজ করেন, টিম হিসেবে নয়।

ষষ্ঠত ঃ ক্যাবিনেটের কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন্ত্রীসভা হল একটি আইনগত সংস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে ক্যাবিনেটের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেই হয়; ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার তথ্যের ভার বহন করতে হয় না।

ব্রিটেনকে ক্যবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয় বলে মন্ত্রীসভার সঙ্গে ক্যাবিনেটের পার্থক্য নিরূপণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী —৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ক্যাবাল শব্দটি থেকে ক্যাবিনেট শব্দটির জন্ম।

(খ) মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(গ) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

(ঘ) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের আইনগত ভিত্তি আছে।

পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক নির্ণয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বগত ধারণা অনুযায়ী ব্রিটেনের আইনসভাই আইনপ্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা আজ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় তার খসড়া প্রস্তাব করে ক্যাবিনেট এবং তা উত্থাপনও করেন কোনও না কোনও মন্ত্রী। ক্যাবিনেটের সদস্যরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু পার্লামেন্ট, বিশেষত কমন্সসভায় সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত সাহস দেখান না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। উচ্চকক্ষ লর্ডসভা ও নিম্নকক্ষ কমন্সসভা। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে কমন্সসভার ভূমিকা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বাৎসরিক বাজেট কমন্সসভার তরফ থেকে শুধু পেশই করা হয়। কমন্সসভার সদস্যদের

বিশেষীকৃত কোনও জ্ঞান না থাকার দরুন কোনও আলোচনা ছাড়াই বাজেট কমন্সসভায় অনুমোদিত হয়। আর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে এই সুযোগে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়েছে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করাই পার্লামেন্ট বা আইনসভার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানকালে জটিল সমাজব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আইনসভার বেশির ভাগ সাধারণ সদস্যেরই তা থাকে না। তদুপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বর্তমানে জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিপুল আইন প্রণয়ন প্রয়োজন তা প্রণয়ন করার সময় ও সুযোগ কোনওটাই পার্লামেন্টের বিশেষত আইনসভার হয় না। এই অবস্থায় পার্লামেন্ট আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। একেই বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন। এই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা ততই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে কমন্সসভার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিরোধিতার সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্সসভা গঠনের জন্য রাজা বা রানিকে পরামর্শ দিতে পারেন।

তবে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

(খ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্যাবিনেটকে সংযত থাকতে বাধ্য করে।

(গ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, বাজেট বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও পার্লামেন্ট অর্থাৎ কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) ক্যাবিনেট সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১৯৩৭ সালের 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল।

(২) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই মুখ্য শাসক। ক্যাবিনেটই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থা। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সমবেতভাবে ক্যাবিনেটকেই গ্রহণ করতে হয়।

(৩) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, এই ব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা। কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। প্রত্যেক মন্ত্রী দলীয় নীতি ও শৃংখলার দ্বারা আবদ্ধ। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকার ও সরকারি দলের সাফল্য ও প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল।

(৫) আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানকার সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু ক্যাবিনেটের সমস্যরা পার্লামেন্টেরও সদস্য, সেহেতু এখানে এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। ফলে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পেছনে পার্লামেন্টের সক্রিয় সমর্থন থাকে। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত।

(৬) গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্বশীলতা। পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রীরা যেমন একদিকে কোনও একটি প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীরা যৌথভাবে সমগ্র ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণেই কোন মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জাবাবদিহি করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

(৮) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতেই হয়।

ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত নন, তবু এককথায়

বলা যায় যে অতীতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব। তবে আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জ-এর সময় থেকে।

ক. ক্যাবিনেটের গঠন

গ্রেট ব্রিটেন কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে এবং ওই দলের নেতা বা নেত্রীকে রানি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। এই মন্ত্রীসভা থেকে কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। ক্যাবিনেটেরও স্থায়িত্ব তাই পাঁচ বছর। তবে তার মধ্যে কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেটও বাতিল হয়ে যায়।

কতজন সদস্য নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হবে সে সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যাও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত কারা হবে প্রধানমন্ত্রীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণভাবে ১৪ থেকে ২৪ জন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। ১৯২২ সালে গ্রেট ব্রিটেন যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪। এটিই ছিল ব্রিটেনের ক্ষুদ্রতম ক্যাবিনেট। আবার ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের নেতৃত্ব যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচারের ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ছিল ২১।

ক্যাবিনেটের সদস্য হতে গেলে সেই ব্যক্তিতে প্রথমত পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমত প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল যাতে প্রতিনিধিত্ব পায় সেদিকেও প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্যাবিনেট সাধারণত ট্রেজারির প্রথম লর্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাবিনেটের মধ্যে আবার ইনার ক্যাবিনেট, কিচেন ক্যাবিনেট এবং শ্যাডো ক্যাবিনেটও থাকে। প্রথম দুটি হল প্রধানমন্ত্রীর অতি বিশ্বস্ত এবং দলের একেবারে প্রথমসারির নেতাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর অন্য নাম। শ্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়া মন্ত্রীপর্ষদ হল বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প গোষ্ঠী। যার সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সরকারের এক একটি বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং যদি কখনো মন্ত্রীসভার পতন হয় তখন ওই ছায়া মন্ত্রীপর্ষদই যেন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

খ. ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট হল শক্তিশালী কার্যনির্বাহী সংস্থা। ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

(১) নীতি নির্ধারণ ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট একটি নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে। ওই নীতির ভিত্তিতেই পরে অন্যান্য বিভাগের নীতি নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব হল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবায়িত করা। ক্যাবিনেট কেবল বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্যই নীতি নির্ধারণ করে না। সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(২) আইন প্রণয়ন ঃ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পার্লামেন্টে বিল উত্থাপিত হয়। সে সব বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সেইসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বিলের খসড়া তৈরি করে পার্লামেন্টের কাছে তা পেশ করেন। বর্তমানে কেবল বিল উত্থাপন করেই ক্যাবিনেট ক্ষান্ত থাকে না; পার্লামেন্টে বিলটি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও ক্যাবিনেটকে গ্রহণ করতে হয়।

(৩) **অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ঃ** আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলেও নানা করণে এই সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রণীত আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, তাকে বিশদ চেহারা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা উপধারা প্রণয়ন এই অর্পিত আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

(৪) **পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ** পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুরু করে অধিবেশন স্থগিত রাখা বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কোন্ কোন্ বিল উত্থাপন করা হবে, কোন কোন প্রস্তাবের ওপর কে কে বক্তব্য রাখবেন, সরকার পক্ষের মূল বক্তা কে কে হবেন, বিরোধী পক্ষ বলার জন্য কতক্ষণ সময় পাবে, তার সব কিছুই ক্যাবিনেট কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

(৫) **শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** ক্যবিনেটের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন। শাসনবিভাগের ক্ষমতা আইনগতভাবে রানির হাতে ন্যস্ত। তবে বাস্তবে রানি ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী এই ক্ষমতা ভোগ করেন। ক্যাবিনেট প্রশাসনিক কর্তৃত্বের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৬) **বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ঃ** প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সরকারের

বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। এই সঙ্গতিসাধনের কাজটি করে ক্যাবিনেট বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালিত না হলে সরকারের সাফল্য ক্ষুন্ন হয়।

(৭) **পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ঃ** বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতি নিধারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শাসনবিভাগকেই সম্পাদন করতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে এই দায়িত্ব বহন করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকেন। কিন্তু বাস্তবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটের হাত থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন—আর্জেন্টিনার ফকল্যান্ডে দ্বীপ দখল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার গ্রহণ করেছিলেন।

(৮) **সংযোগসাধনমূলক কার্যাবলী ঃ** সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণকে সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা। এই কারণে সরকার তথ্যদপ্তর, বেতার, দূরদর্শন, পুস্তিকা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেশ করে। এই তথ্যের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই কারণেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও জনসংযোগমূলক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(৯) **বাজেট প্রণয়ন ঃ** অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করেন। ক্যাবিনেটে আলোচনার পরই বাজেট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় বাজেট পেশ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়িত্ব হল কমন্সসভায় বাজেটকে সমর্থন করা। কমন্সসভায় বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই পার্লামেন্ট বাজেট পেশের আগে ক্যাবিনেটের সভায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়।

(১০) **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ক্যাবিনেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। যেমন অর্থদপ্তরের সচিব, ক্যাবিনেটের পরিকল্পনা বিষয়ক অফিসার বা রাজপরিবারের কোনও ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেলের পদে নিয়োগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বিচারপতি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ইত্যাদি পদে নিয়োগের মূল দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। রানির নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই নিয়োগ কার্যকর হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে ক্যাবিনেটের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছাই ক্যাবিনেটের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মার্গারেট থ্যাচারের নাম উল্লেখ করা যায়। এই কারণে বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞই গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

০২.৫ সারাংশ

গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক আছেন। তিনি হলেন রাজা বা রানি। তিনি নামে শাসক। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত অছে প্রধানন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। ব্রিটেনের এই রাজশক্তি বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজা বা রানির কিছু রাজকীয় বিশেষাধিকার আছে। রাজশক্তির ক্ষমতার আর একটি উৎস হল পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে রাজতন্ত্র এখন একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এক হাজার বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অবক্ষয়ের দিকে।

ব্রিটেনে প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। মন্ত্রীপরিষদ সব মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভারই একটি অংশ। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়েই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। কোন্ দপ্তর এবং কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, তা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিবদের নিয়ে মন্ত্রীসভা বা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। তবে বাস্তবে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁকে একনায়ক বলা যায় কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পদাধিকারী বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং পিছনে শাসকদলের দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকলে ব্রিটিশ প্রধনমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন।

০২.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। আধুনিক অর্থে ব্রিটেন ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব কবে থেকে?

২। কমন্সসভা কিভাবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। সংক্ষেপে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী কী কী?

৪। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়?

৫। ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব বলতে কী বোঝায়?

০২.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার দুটি উৎস হল (ক) রাজকীয় বিশেষাধিকার এবং (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবেন; (খ) পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানি স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

৩। কোন নির্দিষ্ট সময়ে নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে কাজ করার আইনগত ক্ষমতার যে অবশিষ্টাংশ এখনও রাজা বা রানির হাতে আছে তাকেই রাজশক্তির বিশেষাধিকার বলে।

অনুশীলনী—২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন রাজা বা রানি।

২। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩। উপনিবেশগুলি সম্পর্কে ব্রিটেনের রাজা বা রানি বা রাজশক্তি প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে যেসব আদেশ বা নির্দেশ ঘোষণা করেন, সেগুলিকে স-পরিষদ রাজাজ্ঞা বলে।

৪। রাজা বা রানির একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা হল তিনি বিচারলয়ে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস বা মুকুব করতে পারেন তবে এই ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করতে পারেন মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী।

অনুশীলনী—৩

১। নিরঙ্কুশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ

২। প্রস্তরখন্ড

৩। যোগসূত্র।

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথায় সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের সময়। রাজা প্রথম জর্জ যেহেতু ক্যাবিনেট সভায় উপস্থিত থাকতেন না সেহেতু তাঁর সময় থেকেই ক্যাবিনেট গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হতে থাকে এবং প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

২। সাধারণত যে সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সেগুলি হলো—(ক) প্রশ্নজিজ্ঞাসা, (খ) নিন্দাসূচক প্রস্তাব, (গ) মুলতুবি প্রস্তাব, (ঘ) ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব, (ঙ) অনাস্থা প্রস্তাব।

৩। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী হল ঃ (ক) নীতি নির্ধারণ, (খ) আইন প্রণয়ন, (গ) পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন, (ঘ) শাসনবিভাগে নিয়ন্ত্রণ, (ঙ) বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়, (চ) বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

৪। ব্রিটেনে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। প্রত্যেক মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হয় তেমন অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

৫। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পয়েছে। ক্যাবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকেই 'ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়।

০২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather, MacMillan*—The British Constitution. St. Martin's Press, 1970

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮

৪। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। সুদর্শন ভট্টাচার্য—(প্রশ্নোত্তরে) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০৩ ❑ পার্লামেন্ট

গঠন

০৩.১ উদ্দেশ্য

০৩.২ প্রস্তাবনা

০৩.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-ক্রমবিকাশ

লর্ডসভা

কমন্সসভা

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

০৩.৪ সারাংশ

০৩.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০৩.৬ উত্তরমালা

০৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কীভাবে গঠিত হয়েছিল।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ লর্ডসভা ও কমন্সসভার গঠন ও কার্যাবলী।
- নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় বিরোধী দলের ভূমিকা।
- পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা।

০৩.২ প্রস্তাবনা

ব্রিটেন পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। এখানে তত্ত্বগতভাবে পার্লমেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটেনে অলিখিত সংবিধান এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রাধান্য সেহেতু পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও ভূমিকাও অনেকটাই

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পার্লামেন্টের একটি অগণতান্ত্রিক উপাদান হল লর্ডসভা। বস্তুত পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

এই এককে লর্ডসভা ও কমন্সসভা দুটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কমন্সসভাই যেহেতু মূল ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তত্ত্বগতভাবে কমন্সসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তা ক্যাবিনেটের একনায়কত্বে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব আবার এসে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে।

০৩.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট—ক্রমবিকাশ

পার্লামেন্ট গ্রেট বিটেনের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা। রাজা বা রানি, লর্ডসভা এবং কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সাধারণত রাজাসহ-পার্লামেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান পার্লামেন্ট কয়েক শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য উইলিয়াম নিজের মোনোনীত সামন্ত, নাইট উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাজকদের নিয়ে একটি 'মহাপরিষদ' গঠন করেন। এই মহাপরিষদই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবর্তনে প্রাথমিক স্তর। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে সামন্তশ্রেণি, যাজক এবং নাইট ও বার্জেসগণ পৃথকভাবে মিলিত হতেন। এর ফলে পার্লামেন্ট তিনটি কক্ষে পরিণত হতে আরম্ভ করে। পরে সামন্তশ্রেণি ও যাজকদের একটি কক্ষে এবং নাইট, বার্জেস ও নাগরিকদের আর একটি কক্ষে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম কক্ষটি লর্ডসভা ও দ্বিতীয় কক্ষ কমন্সসভা নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকেই ব্রিটেন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সূত্রপাত।

লর্ডসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই নয়, লর্ডসভা হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ। বিশ্বের প্রাচীনতম এই উচ্চকক্ষ ব্রিটেনের অন্যান্য সরকারি সংস্থার মত দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের ফল। লর্ডসভার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই আর্বিভাবের সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি এই কক্ষ কখনও জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়নি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভা বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ। বর্তমানে লর্ডসভা নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

(১) রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সদস্যগণ।

(২) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত লর্ডগণ।

(৩) স্কটল্যান্ডের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধিধারী লর্ডসভার সদস্যগণ।

(৪) আয়ারল্যান্ডের লর্ডগণ (বর্তমানে লর্ডসভায় আয়ারল্যান্ডের লর্ড নেই।)

(৫) দেশের প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের মধ্যে থেকে নয়জন বেতনভুক্ত আপিল লর্ড এই সভার সদস্য।

(৬) লর্ডসভার সদস্যদের মধ্যে ২৬ জন ধর্মীয় লর্ড আছেন।

(৭) শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে নিযুক্ত আজীবন লর্ডগণ লর্ডসভার সদস্য। উল্লেখযোগ্য ব্রিটেন বসবাসকারী ভারতীয় অধ্যাপক মেঘনাদ দেশাই ও প্রখ্যাত শিল্পপতি স্বরাজ পল লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়ে এই সভার সদস্য হয়েছেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত লর্ডদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ ডিউক (Duke), মার্কোয়েস (Marquess), আর্ল (Earl), ভাইকাউন্ট (Viscount) এবং ব্যারেন (Barons)। অধিকার স্বীকৃত ছিল না। পরে মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের লর্ডসভার অধিবেশনে যোগদানের অধিকার আছে। তবে তার বয়স কমপক্ষে একুশ বছর হতে হবে।

কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের লর্ডসভা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ হলেও বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে লর্ডসভার ক্ষমতা ও গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভা এখনও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। লর্ডসভার এই সমস্ত কাজকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভা আইনসভার উচ্চকক্ষ। সেই হিসেবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করাই লর্ডসভার প্রথম কাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯১১ সালের আগে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভা যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করলেও পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৯ সালে প্রণীত আইনের ফলে লর্ডসভার ক্ষমতা আরও কমে যায়। বর্তমানে সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিলটিকে এক মাস আটকে রাখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(ক) অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কিত বিলগুলি লর্ডসভায় উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়ার পর তা কমন্সসভায় যায়। (খ) লর্ডসভা আইনের সংশোধনী কাজের দায়িত্ব পালন করে। (গ) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা যে ভূমিকা পালন করে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (ঘ) কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার আলোচ্যসূচীর পরিমাণ সীমিত থাকায় লর্ডসভার পক্ষে অনেক বেশি সময় নিয়ে কোনও বিষয় আলোচনা করা সম্ভব।

(২) **শাসন সংক্রান্ত কাজ ঃ** লর্ডসভার মত একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও কিছু শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারি নীতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে লর্ডসভা শাসনবিভাগকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। বিচারপতিদের পদচ্যুত করার ব্যাপারেও লর্ডসভা